

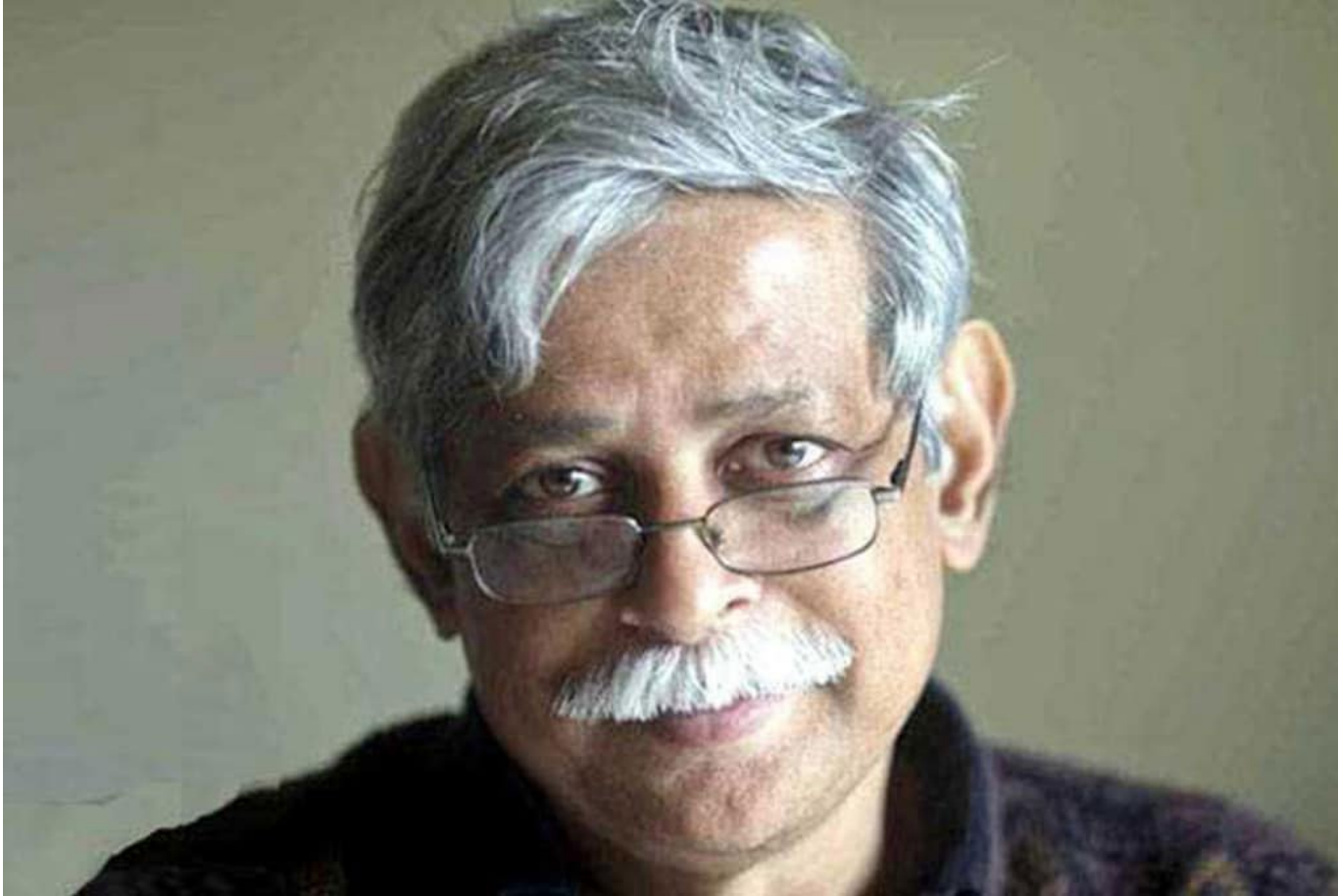
কালের বর্গ

আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ২৩:১০

সাদাসিধে কথা

একটি সমাবর্তন ভাষণ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল



ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখ ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমি একটি ভাষণ দিয়েছিলাম। পৃথিবীটা কিছু বোঝার আগে খুবই দ্রুত পালে যাচ্ছে। আমি লক্ষ করেছি, তাই কম বয়সী তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে কথা বলার

সময়ও আমি বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলতে শুরু করেছি। এ ভাষণেও একই ব্যাপার ঘটেছে। আমার কথা কেউ কোনো গুরুত্ব দেবে কি না জানি না; কিন্তু আমি ভাঙা রেকর্ডের মতো বলেই যাচ্ছি। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কয়েক হাজার তরুণ-তরুণীর সামনে যে কথাগুলো বলেছিলাম, সে কথাগুলো অন্যদেরও বলার ইচ্ছা করে। তাই আমার সেই ভাষণের একটি-দুটি লাইন ঘষামাজা করে এখানে তুলে দিচ্ছি।

আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা :

আজকের দিনটি তোমাদের জীবনের খুবই আনন্দের একটি দিন! আমার খুবই ভালো লাগত, যদি আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের সমাবর্তনের সঙ্গে তোমাদের এই অসাধারণ সমাবর্তনের তুলনা করে কিছু একটা বলতে পারতাম। আমি সেটি করতে পারছি না। এর কারণ আমাদের কোনো সমাবর্তনই হয়নি! সমাবর্তনে কত আনন্দ হয় আমি জানি না; গাউন পরে সমাবর্তন বক্তার বক্তব্য শুনতে কিংবা বন্ধুর সঙ্গে ছবি তুলতে কেমন লাগে, সেটিও আমি জানি না। কাজেই তোমাদের দেখে আমি যে রকম আনন্দ অনুভব করছি, একই সঙ্গে সে রকম একটুখানি হলেও হিংসাও অনুভব করছি।

১.

আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাকে তোমাদের সামনে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এখানে দাঁড়িয়ে আমার তোমাদের নতুন জীবনের স্বপ্নের কথা বলার কথা। একটি সময় ছিল, যখন এই বিষয় ছিল অনেক কঠিন। কারণ তখন স্বপ্ন দেখার বিশেষ কিছু ছিল না। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী বছর আগে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম তখন আমার শিক্ষকরা আমাকে বলেছিলেন, ‘বাবারা, তোমরা পড়তে এসেছ খুব ভালো কথা; কিন্তু জেনে রেখো, এখান থেকে পাস করে তোমরা কিন্তু কোনো চাকরি পাবে না। এই দেশে তোমাদের জন্য কোনো চাকরি নেই, কোনো কাজ নেই!’ সেটি ছিল সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ। দেশটি তখন যত যুদ্ধবিধ্বস্তই হোক না কেন, সেটি কিন্তু ছিল নিজের একটি স্বাধীন দেশ। সেই দেশে যখন ইচ্ছা আমি মাথা উঁচু করে রাস্তায় হাঁটতে পারব, পাকিস্তান মিলিটারি গুলি করে আমাকে মেরে ফেলবে না, রাজাকার-আলবদর ধরে নিয়ে যাবে না। সেই আনন্দই আমাদের জন্য এত তীব্র ছিল যে চাকরি বা কাজের মতো বিষয়ের কোনো গুরুত্বই ছিল না! কাজেই এখন আমি যখন দেখি, সরকারি চাকরিতে কোটার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে না, নিজেকে রাজাকার হিসেবে পরিচয় দেয়, আমি অবাক না হয়ে পারি না!

আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদের সেই বাংলাদেশ থেকে তোমাদের বাংলাদেশ কিন্তু অনেক ভিন্ন। আমি আমার ছাত্রজীবন শেষ করে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি তখন আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১১০ ডলার। এখন তোমাদের মাথাপিছু আয় এক হাজার ৭০০ ডলার থেকেও বেশি। (এটি কিন্তু যথেষ্ট নয়। ভিয়েতনাম আমাদের পরে আমাদের থেকে খারাপ অবস্থা থেকে শুরু করে আমাদের থেকে অনেক ভালো অবস্থায় পৌঁছে গেছে!) যুক্তরাজ্যের প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে যে সামনের বছরগুলোতে সারা পৃথিবীর যে তিনটি দেশ খুবই দ্রুতগতিতে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখবে, তার একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। কাজেই এখন তোমাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখানো খুবই সহজ। আমার আলাদা করে তোমাদের কিছু বলতে হবে না, শুধু মনে করিয়ে দিতে হবে, ‘এটি তোমাদের বাংলাদেশ, তোমরা যেভাবে চাও সেভাবে এটিকে গড়ে তোলো!’

২.



আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি, তোমরাও উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছ; এটি অপূর্ব সুন্দর একটি দৃশ্য। কিন্তু এটি কি শুধুই সুন্দর একটি দৃশ্য, নাকি তার চেয়ে বেশি আরো কিছুর নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে পৃথিবীর বড় বড় গুণীজন অনেক ভেবেচিন্তে বলেছিলেন, ‘এখন থেকে পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান।’ মাঠের ফসল বা তেলের খনি নয়, যুদ্ধাশ্রের কারখানা বা ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিও নয়, পৃথিবীর সব সম্পদ থেকেও

বড় সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। গত চার বছর পরিশ্রম করে তোমরা সেই জ্ঞান অর্জন করেছ বলে আজ তোমরা আমার সামনে বসে আছ। যার অর্থ, আমি যখন তোমাদের দিকে তাকাই, আমি আসলে একটি জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে তাকাই, সোনার খনি থেকেও মূল্যবান সম্পদের দিকে তাকাই। এই সম্পদের মূল্য কত? শুধু টাকা বা ডলার দিয়ে এই সম্পদের মূল্য ঠিক করা যাবে না; এটি তার থেকে অনেক বেশি। কারণ এটি নির্ভর করে তোমাদের স্বপ্নের ওপর, তোমাদের কল্পনাশক্তির ওপর, তোমাদের আগ্রহের ওপর, উৎসাহের ওপর, তোমাদের পরিশ্রমের ওপর, দেশের জন্য তোমাদের ভালোবাসার ওপর।

৩.

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের তিনটি করে মা থাকে। একটি জন্মদাত্রী মা, একটি মাতৃভাষা এবং আরেকটি হচ্ছে মাতৃভূমি। এটি ফেব্রুয়ারি মাস। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের নয়, এখন সারা পৃথিবীর মাতৃভাষা দিবস। আমাদের মাতৃভাষাটি কত মধুর সেটি জানতে চাও? খুব সহজ একটি উদাহরণ দিয়ে তোমাদের মনে করিয়ে দিতে পারি। আমাদের জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইনটি হচ্ছে, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।’ এর শেষ তিনটি শব্দ দিয়েও একটি বাক্য হতে পারে, সেটি হচ্ছে, ‘আমি তোমায় ভালবাসি’। এই তিনটি শব্দ দিয়ে পারমুটেশন করে সব মিলিয়ে আমরা ছয়ভাবে বাক্যটি লিখতে পারি :

‘আমি তোমায় ভালবাসি, আমি ভালবাসি তোমায়, তোমায় আমি ভালবাসি, তোমায় ভালবাসি আমি, ভালবাসি আমি তোমায়, ভালবাসি তোমায় আমি!’

তোমরা কি লক্ষ করেছ, এই ছয়টি বাক্যের প্রতিটি কিন্তু শুদ্ধ বাক্য। এবার ইংরেজির সঙ্গে তুলনা করি। I Love you. এটিকে কি অন্য কোনোভাবে বলা সম্ভব? I you love? Love I you? কিংবা Love you I? কিংবা You I love? You love I? চেষ্টা করে দেখো, মূল বাক্যটি ছাড়া অন্য কোনোটি কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়! এই ছোট উদাহরণটি দিয়েই কিন্তু তোমরা বুঝতে

পারবে, আমাদের মাতৃভাষা কত সাবলীল, কত ছন্দময়। (সে কারণে মনে হয় বাঙালি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে কবি সবচেয়ে বেশি!) এ রকম অনেক উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। তোমরা নিজেরাই সেগুলো খুঁজে বের করতে পারবে। ইংরেজি ভাষার আগ্রাসনে আমরা যখন ব্যতিব্যস্ত তখন ভাষার মাসে প্রিয় মাতৃভাষার জন্য কি আমরা একটুখানি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি না?

আমাদের আরেকজন মা হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমি। তোমরা জানো, এই মাতৃভূমি কেউ এমনি এমনি আমাদের হাতে তুলে দেয়নি; অনেক মূল্য দিয়ে এটি আমাদের কিনতে হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর লন্ডন টাইমস লিখেছিল, ‘যদি রক্ত স্বাধীনতার মূল্য হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ মূল্যে স্বাধীনতা কিনেছে।’ সেই মাতৃভূমি হচ্ছে আমাদের আরেকটি মা। আমার জন্মদাত্রী মা যদি বৃদ্ধা হন, অশিক্ষিতা হন, অসুন্দর হন, সাদাসিধা হন, তবু তাঁকে ফেলে যে রকম একজন কম বয়সী স্মার্ট সুন্দরী মহিলাকে আমরা মা ডাকি না, দেশের বেলাতেও সে রকম। আমার দেশটি যদি দরিদ্র হয়, দুঃখী হয়, সাদাসিধা হয়, দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়, তার পরও আমি আমার নিজের দেশ ছেড়ে আরেকজনের ঐশ্বর্যশালী, চকচকে, জৌলুসে ভরা একটি দেশকে নিজের মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করে ফেলি না। আমাদের মায়েদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। আমরা কি নিজেদের জিজ্ঞেস করতে পারি, আমি কি আমার মায়ের সেই দায়িত্ব পালন করেছি? আমার জন্মদাত্রী মা, আমার মাতৃভাষা এবং দেশমাতৃকা?

৪.

আমাকে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই ভেবেছেন, আমি তোমাদের নতুন জীবনের সন্ধিক্ষেপে কিছু উপদেশ দিতে পারব। আমি সেটি কতটুকু পারব জানি না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার কিছু অংশ তোমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারি। যে বিষয়গুলো শেখার জন্য আমার চুলে পাক ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে, তোমরা অনেক কম বয়সেই সেই অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারবে। তুমি তোমাদের নিজের জীবনে সেটি ব্যবহার করবে কি করবে না, সেটি তোমাদের নিজেদের ব্যাপার!

আজ থেকে প্রায় দুই যুগ আগে কার্নেগি মিলন ইউনিভার্সিটিতে হার্বাট সাইমন নামের একজন অনেক বড় মানুষের সঙ্গে আমার সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। তোমরা যারা তাঁর নাম শুনেছ তারা জানো, তিনি ১৯৭৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আজকাল ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ নামে যে শব্দটি আমরা সারাক্ষণ শুনতে পাই, তিনি প্রথম এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। আমার দীর্ঘজীবনে আমি যে কয়জন অস্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার মানুষ দেখেছি, তিনি ছিলেন তার একজন। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগটি ছিল আমার জন্য একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। অনেক কথার মাঝে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি ছিল কিন্তু খুবই বিচিত্র, যেটি আজকে এখানে আমি তোমাদের বলতে চাই।

যে সময়ের কথা বলছি তখনো ইন্টারনেটের প্রচলন হয়নি, ই-মেইল মাত্র ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আমরা সবাই তখন ই-মেইল নিয়ে খুব উত্তেজিত। যে চিঠিটি পৌঁছাতে আগে এক সপ্তাহ লেগে যেত, সেটি এখন মুহূর্তে চলে যাচ্ছে, উত্তেজিত না হয়ে উপায় কী? আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, হার্বাট সাইমন কিন্তু ই-মেইল নিয়ে মোটেও উত্তেজিত নন। তিনি বরং খানিকটা বিরক্ত! তিনি বললেন, হঠাৎ করে সবাই আমাকে ই-মেইলে রাজ্যের তথ্য পাঠাতে শুরু করেছে! আমার যখন প্রয়োজন হবে আমি তখন সেই তথ্য খুঁজে নেব; কিন্তু অন্যরা কেন না চাইতেই আমাকে অপপ্রয়োজনীয় তথ্য পাঠাবে? আজ থেকে ২০ বছর আগে মানুষ তখনো তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত হতে শুরু করেনি; কিন্তু হার্বাট সাইমন তখনই বিপদটি টের পেয়েছিলেন। তিনি নিজের মতো থাকতে চান, অন্যরা কেন তাঁর নিজের স্থানটুকুতে নাক গলাবে?

আমার বয়স কম ছিল, খানিকটা গোঁয়ারের মতো এত বড় একজন মানুষের সঙ্গে তর্ক করে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে নেটওয়ার্কিং বিশাল একটি ব্যাপার, তথ্যের অবাধ প্রবাহ হচ্ছে সভ্যতার চিহ্ন, আমাদের এটি গ্রহণ করতে হবে। হার্বাট সাইমন আমার কথাতে কোনো গুরুত্ব দেননি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ প্রায় ২৫ বছর পরে হঠাৎ করে আমি হার্বাট সাইমনের সেই কথাগুলোর মর্ম বুঝতে শুরু করেছি। আমাদের চারপাশে তথ্য-প্রযুক্তির অতিকায় দানবরা-ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট, আমাজন কিংবা অ্যাপেল আমাদের সবাইকে তাদের নেটওয়ার্কে আশ্বেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। ইন্টারনেটের কানাগলিতে আমাদের একাধিক প্রজন্ম পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। চারপাশে শুধু তথ্য আর তথ্য। প্রয়োজন থাকুক আর না-ই থাকুক, হয় আমি সেই তথ্য দিচ্ছি, না হয় সেই তথ্য নিচ্ছি। আমার নিজের সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, তথ্য-প্রযুক্তির অতিকায় প্রতিষ্ঠানগুলো তার চেয়ে অনেক বেশি জানে। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নামের বিচিত্র এক মাদকে সবাই আসক্ত। ডাইনিং টেবিলে বসে ছোট ছেলেটি সিগারেট খেলে মা-বাবারা চমকে ওঠেন। কিন্তু স্মার্টফোনে ফেসবুকে মগ্ন হয়ে থাকলে তারা কিছুই মনে করেন না, যদিও দুটির মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, দুটিই কিন্তু আসক্তি। একবার আক্রান্ত হলে দুটির আরোগ্যের জন্য একই ধরনের নিরাময় কেন্দ্রে যেতে হয়।

কাজেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি আমি তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা কি স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, নোটবুক এবং টেলিভিশনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবে, নাকি তোমার পাশে বসে থাকা রক্ত-মাংসের টগবগে জীবন্ত একজন মানুষের চোখের দিকে তাকাবে? আমার আজকের বক্তব্য থেকে তোমরা যদি একটিমাত্র বাক্য মনে রাখতে চাও, তাহলে আমার এই বাক্য মনে রেখো : ‘তোমরা যত ইচ্ছা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করো; কিন্তু প্রযুক্তি যেন কখনো তোমাদের ব্যবহার করতে না পারে।’

৫.

তোমরা বাংলাদেশের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হতে যাচ্ছ। তোমরা কি লক্ষ করেছ, তোমার বিদ্যাপীঠটিকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়? একটি গ্রামের নয়, একটি শহরের নয়, একটি বিভাগের নয়, এমনকি একটি দেশেরও নয়, এটি সারা বিশ্বের একটি বিদ্যালয়। ইংরেজিতে এই বিদ্যাপীঠটি আরো বেশি ব্যাপক, ইউনিভার্সিটি; অর্থাৎ পুরো ইউনিভার্স বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যাপীঠ। এই নামকরণ কিন্তু শুধু শুধু হয়নি। যখন একটি বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনা করা হয়, সেখানে কিন্তু সংকীর্ণতার কোনো স্থান নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হতে হয় সত্যিকার অর্থে সারা বিশ্বের নাগরিক। দেশ, কাল, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়-এ রকম কোনো বিভেদ লালন করে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা ছাত্রী হওয়া যায় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা ছাত্রী হিসেবে তুমি নিজেকে সারা পৃথিবীর সব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী হিসেবে কল্পনা করে নেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই আরো একটি বিষয় লক্ষ করেছ, এটি কিন্তু একটি ট্রেনিং সেন্টার নয়। প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ে কিছু দক্ষতা তোমাদের শিখিয়ে দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে অনেক কম সময়ে তোমাদের সেগুলো শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য তোমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে শেখানো। লিবারেল আর্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে তোমাদের জন্য এ কথাটি অন্যদের থেকে আরো অনেক বেশি সত্যি।

আজকে তোমরা আমার সামনে বসে আছ। কারণ তোমরা সবাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটি ধাপ শেষ করেছ। আমি এখন তোমাদের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চাই। তোমরা অনেকেই হয়তো তথ্যটি জানো; কিন্তু হয়তো পুরোপুরি বিশ্বাস করোনি। তথ্যটি হচ্ছে-তোমার এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সার্টিফিকেটটিই কিন্তু যথেষ্ট নয়, জীবনে সাফল্যের জন্য এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু প্রয়োজন হয়। তোমরা অনেকেই সেগুলো এর মাঝে শিখে গেছ, যারা শেখোনি তারা জীবনে ধাক্কা খেতে খেতে শিখে যাবে।

জীবনের জন্য যদি প্রস্তুতি নিতে চাও, তাহলে ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুতি নাও। আমি যদি আমার নিজের জীবনের পেছন দিকে তাকাই, আমি অবাক হয়ে দেখি সেখানে সাফল্য বলতে গেলে নেই, বেশির ভাগই ব্যর্থতা! মাঝেমধ্যে মনে হয়, যেখানেই হাত দিয়েছি সেখানেই ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থতার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, গৌরব নেই; কিন্তু এটি জীবনের একটি অংশ। যার জীবনে ব্যর্থতা নেই, বুঝতে হবে সে তার জীবনে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেনি। ব্যর্থতা আসবে; কিন্তু সেই ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে লেগে থাকাই হচ্ছে জীবন। মনে রেখো, স্বপ্ন সফল হওয়া জীবন নয়, স্বপ্নের জন্য লেগে থাকা হচ্ছে জীবন। সেই জীবন কিন্তু খুবই ছোট, দেখতে দেখতে তোমার জীবনটুকু শেষ হয়ে যাবে। কাজেই এই ছোট সময়টি যেন অর্থপূর্ণ হয়, আনন্দময় হয় সেটি তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে। আমি আশা করছি, জীবনকে পরিপূর্ণ করতে গিয়ে তোমরা ক্লাসরুমে যেটুকু শিখেছ, ক্লাসরুমের বাইরে শিখেছ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি।

এই চমৎকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে একজন চমৎকার পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে আজ তোমরা বের হয়ে যাচ্ছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মশালটি তোমাদের হাতে। আমরা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি দেখার জন্য, সেই মশালের আলোতে তোমরা কতটুকু জায়গা আলোকিত করতে পারো।

সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা।

লেখক : কথাসাহিত্যিক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

Print

সম্পাদক : ইমদাতুল হক মিলন,

নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।

বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com